চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পোশাক পরিচ্ছদ ও বয়নতন্তু

বস্ত্র তৈরির উপাদান ও প্রকারভেদ

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে চরকায় সুতা কেটে তাঁতিরা বস্ত্র তৈরি করত। সেই বস্ত্র দিয়ে পোশাক তৈরি করে মানুষ চাহিদা মেটাত। বস্ত্র তৈরির মূল উপকরণ তন্তু। এই তন্তু চুলের ন্যায় বা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এক প্রকার আঁশ। বিভিন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগুণের মধ্যে পার্থক্য আছে। এজন্য সকল বস্তুর আঁশ থেকে কাপড় তৈরি করা যায় না। তুলার আঁশ সরু, মসৃণ ও নমনীয় বলে কাপড় প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু পাটের আঁশ মোটা, খসখসে বলে কাপড় তৈরির বিশেষ উপযোগী নয়।

বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তুর গুণাবলি

১. লম্বা আঁশ বা তন্তু কাপড় বুনার বিশেষ উপযুক্ত। আঁশ ছোট হলেও ভাঁজ থাকলে ঐ আঁশ থেকে শক্ত সুতা তৈরি হয়। যেমন তুলার আঁশ লম্বায় ছোট। কিন্তু ভাঁজ থাকায় তুলা থেকে টেকসই বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

২. আঁশের নমনীয়তা বস্ত্র তৈরির একটি উৎকৃষ্ট গুণ। আঁশ মোচড়ালে বা দুমড়ালে যদি ভেঙে যায় তাহলে বস্ত্র তৈরি করা যায় না।

৩. রং ধারণ করার ক্ষমতা থাকা আঁশের একটি বড় গুণ। ট্যানিন নামক মোম জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ থাকলে আঁশে রং প্রবেশ করতে পারে না।

৪. আঁশের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি গুণ। রেশম বা সিল্ক তন্তুর চাকচিক্যের জন্য রেশমি বস্ত্রের কদর বেশি।

৫. যেসব আঁশের ময়লা সহজে দূর করা যায় সেসব আঁশ বস্ত্র তৈরির জন্য উপযোগী।

৬. আঁশের ক্ষয় প্রতিরোধ করার শক্তি থাকবে।

৭. যেসব আঁশ স্বাভাবিক তাপে, মৃদু ক্ষার বা এসিডে সহজে নষ্ট হয় না সেগুলো বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উপযোগী।

তন্তুর প্রকারভেদ

প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায় এমন স্বাভাবিক তন্তু বস্ত্র তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বস্ত্রশিল্পে কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি তন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে।

বিভিন্ন তন্তুকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রকৃতিজাত বা স্বাভাবিক তন্তু (Natural Fibre)

২। কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি তন্তু (Artificial Fibre)

প্রকৃতিজাত তন্তু উৎপত্তি অনুযায়ী তিন প্রকার। যেমন—

ক. উদ্ভিজ্জ তন্তু : যে তন্তু উদ্ভিদ বা গাছপালা থেকে পাওয়া যায় সেগুলো উদ্ভিজ্জ তন্তু। সুতি, লিনেন, র‍্যামি, পাট ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ তন্তু।

খ. প্রাণিজ তন্তু : যে তন্তু প্রাণী থেকে পাওয়া যায় সেগুলো প্রাণিজ তন্তু। রেশম, পশম প্রাণিজ তন্তু।

গ. খনিজ তন্তু : যে তন্তু খনিজ ধাতু থেকে পাওয়া যায় সেগুলো খনিজ তন্তু। যেমন অ্যাসবেসটস, গ্লাস ইত্যাদি।
কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয় যেমন-

ক. রেয়ন তন্তু : কাঠমন্ড, তুলার ছাঁট থেকে সেলুলোজ সংগ্রহ করে কস্টিক সোডা ও অ্যালকালি দিয়ে রাসায়নিক সংমিশ্রণে রেয়ন তন্তু তৈরি হয়। রেয়ন তিন প্রকার। যেমন- ভিসকস, কিউপ্রামোনিয়াম ও এসিটেট।

খ. সাংশ্লেষিক তন্তু : কয়লা, পানি ও বাতাস ব্যবহার করে মানুষ সাংশ্লেষিক তন্তু তৈরি করে। নাইলন, পলিয়েস্টার, ভিনিয়ন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তু।

তন্তুর শ্রেণীবিভাগ

প্রাকৃতিক তন্তু		
উদ্ভিজ্জ	**প্রাণিজ**	**খনিজ**
তুলা	রেশম	গ্লাস
লিনেন	পশম	অ্যাসবেসটস
র‍্যামি		
পাট		

কৃত্রিম তন্তু	
রেয়ন	**সাংশ্লেষিক**
ভিসকস	নাইলন
কিউপ্রামোনিয়াম	পলিয়েস্টার
অ্যাসিটেট	ভিনিয়ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য ও বাসস্থানের পর যে বস্তুটির বিশেষ প্রয়োজন তা হল পোশাক। মানুষের লজ্জা নিবারণ ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথম পোশাকের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তীতে সভ্যতার বিকাশের সাথে পোশাকের অন্যান্য প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষ সচেতন হল। যেমন–দেহের সৌন্দর্য বাড়ান, দেহের দোষত্রুটি ঢাকা দেওয়া, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, পারিবারিক মানমর্যাদা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

পোশাকের সংজ্ঞা

পোশাক বলতে সাধারণত বেশভূষাকে বোঝায়। মানুষ দেহে যে আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যবহার করে, যার ফলে দেহের শালীনতা রক্ষা, শীত তাপ থেকে রক্ষা, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কাজ করার সুবিধা ও দেহকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা যায়, তাকেই পোশাক বলে। মেয়েদের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ছেলেদের পায়জামা পাঞ্জাবি প্রত্যেকটি এক একটি পোশাক। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব, পদমর্যাদা ও জাতীয়তার প্রকাশ ঘটে।

পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাস

মানুষ কবে পোশাক পরতে আরম্ভ করে তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। এক সময় ছিল যখন পোশাক পরিচ্ছদের কোনো প্রচলনই ছিল না। আদিম যুগে মানুষ মাথার চুল ও চামড়া দিয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি থেকে দেহ রক্ষার মাধ্যমে পোশাকের প্রয়োজন অনুভব করে। খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা পশু শিকার করত। মাংস খাওয়ার পর চামড়া এবং হাড় পড়ে থাকত। মাছের কাঁটা এবং চিকন হাড় চামড়া ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করত। এই চামড়া দিয়ে দেহ ঢেকে রাখত। চামড়া পাথর দিয়ে পিটিয়ে নরম করে দেহ মুড়ে রাখত।

পরবর্তীতে ঘাস, লতা, পাতা দিয়ে কাপড়ের মতো বুনে দেহের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করত। প্রস্তরযুগে মানুষ প্রতিকূল আবহাওয়া ও বন্য প্রাণীর কবল থেকে দেহকে রক্ষার জন্য সেলাইবিহীন পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে চামড়ার বেল্ট বা প্রাণীর লেজ দিয়ে কোমরে বেঁধে রাখত। এর নাম ছিল লয়েন।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ঘোড়া বা ভেড়ার লোম এবং গাছের আঁশ দিয়ে অবসর সময়ে সুতা তৈরি করে কাপড় বুনতে শিখল। সৌন্দর্য বিকাশের জন্য বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাকের প্রচলন হয়।

শিল্প বিপ্লবের জন্য নতুন মেশিন এবং মেশিনের পার্টস আবিষ্কার হওয়ার ফলে অতি আধুনিক পোশাক থেকে শুরু করে চাঁদে যাওয়ার পোশাক আজকাল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সাঁতার, ব্যায়াম ও বিশ্ব অ্যাথলেটিক খেলার বিশেষ পোশাকও মানুষ পরছে। এভাবে ধীরে ধীরে পোশাকের বিবর্তন হয়েছে।

স্বাস্থ্যের সাথে পোশাকের সম্পর্ক

দেহরক্ষার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি দেহের সঠিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যও উপযুক্ত পোশাকের প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের সাথে পোশাকের বিশেষ সম্পর্ক আছে। পোশাক পরিধানের সময় যদি এই সম্পর্কের কথা মনে রাখা যায় তবেই পোশাক পরে আরাম পাওয়া যায়। পোশাক শুধু আরামই দেয় না, স্বাস্থ্যও রক্ষা করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পোশাক পরিধানের কারণ-

১. ঠান্ডা ও গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া।

২. রোগজীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া।

৩. দেহে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি না করা ও

৪. মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা।

ঠান্ডা ও গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া

শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা পোশাক পরি। শীতকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। বায়ুর উষ্ণতা কমে যায়। এ সময় পশমি কাপড় বা গরম কাপড় পরে দেহ ঢেকে রাখলে শীতে আরাম পাওয়া যায়। শীতের উপযোগী কাপড় না পরলে ঠান্ডায় জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গরমের দিনে পরিশ্রমের ফলে মানুষের প্রচুর ঘাম হয়। ঘাম শোষণের জন্য সুতি, ভয়েল ও পাতলা কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করা ভালো। এসব কাপড়ের পোশাক পরে গরমে আরাম পাওয়া যায়। কোনো রকম জরি, লেস বসানো বা আলগা কাপড় বসানো ভারী পোশাক পরলে অধিক গরম লাগে। বাচ্চাদের হাতাকাটা পাতলা সুতি কাপড়ের পোশাক পরালে গরমের সময় আরাম পায় এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

রোগজীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া

পোশাক দ্বারা দেহত্বক ঢাকা থাকায় রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, চর্মরোগ হতে পারে না। দেহের ক্ষত স্থানে জীবাণু প্রবেশে বাধা দিয়ে ঘা শুকাতে সাহায্য করে।

দেহে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি না করা

খুব আঁটসাঁট জামাকাপড়ে শিরা, উপশিরা ও ধমনিতে চাপ পড়ে। রক্ত চলাচলে বাধা পায়। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে কষ্ট হয়। এ সমস্যাগুলো দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। সাধারণত যেসব পোশাক আরামদায়ক, চলাফেরায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না, দেহের বৃদ্ধি বজায় রাখে সে ধরনের পোশাকই শিশু এবং বর্ধিষ্ণু ছেলেমেয়েদের জন্য উপযোগী। এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যা সহজে খোলা যায় ও পরা যায়। খুব আঁটসাঁট পোশাক যেমন ক্ষতিকর আবার অতিরিক্ত ঢিলেঢালা পোশাকও কাজ করার উপযোগী নয়। যেমন বেশি লম্বা ও ঢিলে পোশাক পরে শিশু খেলতে গিয়ে পড়ে হাত–পা ভেঙে ফেলে নতুবা দেহের কোনো অংশ কেটে ফেলে।

মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা

মনের সুস্থতার সাথে দেহের সুস্থতা জড়িত। সুন্দর ডিজাইনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরলে মন প্রফুল্ল থাকে। ব্যক্তিত্ব বাড়ে। মানুষের কাছে সম্মান পাওয়া যায়। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় মন বিষণ্ন করে দেয়। শিশুরা নতুন জামাকাপড় পরলে খুশি হয়, তাদের মন আনন্দে ভরে যায়। সুতরাং পোশাক মানুষের মন প্রফুল্ল রেখে দেহ সুস্থ রাখে।

পোশাক ও জাতীয়তা

মানুষ ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে পোশাক পরে। পোশাক দেখে কোন দেশের লোক এবং কোন জাতি তা বোঝা যায়। পোশাক দিয়ে একটি পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পোশাক দ্বারা মানুষের পেশা, শ্রেণী এবং বয়সের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের মেয়েদের পোশাক, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং সালোয়ার, কামিজ ও ওড়না। ছেলেদের ঘরে পরার পোশাক লুঙ্গি, গেঞ্জি, বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ও অফিসের পোশাক পায়জামা, পাঞ্জাবি এবং শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পোশাক পরে। যেমন শিখদের, মাথার পাগড়ি দিয়ে চেনা যায়। বর্মীদের পোশাক লুঙ্গি ও ফতুয়া, জাপানিদের পোশাক কিমোনো। মধ্য এশীয় মুসলমানরা লম্বা কুর্তা বা তোপ পরে এবং নিচে পরে ছোট প্যান্ট। মেয়েদের পোশাক লম্বা ঘাগরা, কুর্তা, চাদর, মাথার স্কার্ফ এবং সমস্ত শরীর ঢাকা বোরখা। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের শার্ট, স্যুট, টাই ইত্যাদি জাতীয় পোশাক।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পোশাকের ভিন্নতা দেখা যায়। বিশেষ করে, পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতিদের পোশাকে আঞ্চলিক প্রভাব দেখা যায়। ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মনিপুরী ও চট্টগ্রামের মগ, এদের পোশাক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক থেকে ভিন্ন ধরনের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য

প্রতিটি মানুষের জীবনে রয়েছে কিছু মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণ হলে জীবন সন্তুষ্টি ও আনন্দে ভরে ওঠে। পোশাকও এমন একটি মৌলিক চাহিদা যা জীবনের অনেক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। পূর্বে পোশাক পরার উদ্দেশ্য ছিল লজ্জা নিবারণ ও দেহকে গরম, শীত ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে পোশাক পরিধানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য মানুষ জানতে পেরেছে। পোশাকের মাধ্যমে একজন নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। দেহের গঠন, গায়ের রং, আবহাওয়া, পেশা, আধুনিক ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক পরে যে কোনো ব্যক্তি সহজেই অন্যের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পোশাক পরার একটি উদ্দেশ্য হল নিজের সৌন্দর্য বিকাশ করা। সুন্দর, মার্জিত পোশাক মানুষের চরিত্রের গুণাবলি প্রকাশ করে। এতে তার ব্যক্তিত্বও ফুটে ওঠে।

যেসব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পোশাক পরা হয় সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু থেকে দেহকে রক্ষা করা

ঋতুভেদে পোশাকের ভিন্নতা দেখা যায়। শীতের সময় পশমি, ফ্লানেল বা মোটা কাপড়ের পোশাক পরে আরাম পাওয়া যায়। পশমি কাপড় তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় পশমি বস্ত্র ভেদ করে তাপ শরীর থেকে বের হয় না আবার বাইরের ঠান্ডা ও ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

গ্রীষ্মকালে সুতি, লিনেন, ভয়েল ইত্যাদির তৈরি কাপড় পরলে গরম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এসব কাপড় দেহের ঘাম শুষে নেয়। তাপ সুপরিবাহী বলে বাতাস চলাচল করে দেহ ঠান্ডা রাখে।

২. বাইরের ধুলোবালি বা রোগজীবাণু থেকে দেহত্বককে রক্ষা করা

বাতাসে ধুলোবালি, অসংখ্য রোগজীবাণু ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন কাজকর্মে মানুষ প্রতিদিনই বাইরে বের হয়। পোশাক মানুষের দেহাবরণের কাজ করে। পোশাক পরা থাকলে বাইরের ময়লা আবর্জনা ও রোগজীবাণু পোশাকের ভিতর দিয়ে সহজে ত্বকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ডাক্তার এবং নার্সদেরও দেখা যায় রোগী সেবার সময় জীবাণু থেকে রক্ষা

পাওয়ার জন্য হাতে দস্তানা, গায়ে এপ্রোন ও নাকে মুখে মাসক পরে। রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে শরীর সুস্থ রাখা পোশাকের একটি উদ্দেশ্য।

৩. শালীনতা রক্ষা

আদিম যুগে মানুষ কোনো আবরণে দেহ ঢেকে রাখত না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে শালীনতাবোধ জাগে। তখন থেকেই লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের ছাল বাকল পরা শুরু হয়। পরবর্তীতে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

মেয়ে পুরুষ উভয়েরই শালীনতা রক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজন। কিশোরী বয়সে শরীরের পরিবর্তন হয়। সে সময় তাদের দরকার হয় ওড়না এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরে আরামে চলাফেরা করা। পোশাকই দেহের শালীনতা বজায় রেখে সভ্য মানুষকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দেয়। রুচিশীল মার্জিত পোশাক পরিধানকারী সকলের প্রশংসার পাত্র।

৪. শনাক্তকরণ

পোশাক যেমন একটি জাতির পরিচায়ক তেমনি বিশেষ ব্যক্তিকে চেনারও মাধ্যম। সব দেশেই বিশেষ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত পোশাক বা ইউনিফরম রয়েছে। যেমন- পুলিশ, প্রতিরক্ষা, বিমান ও নৌবাহিনী, ডাক্তার, সেবিকা, উকিল, পিয়ন, বাবুর্চি, চৌকিদার, ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে পোশাক তৈরি করা হয়। পোশাক দ্বারা এসব ব্যক্তির কাজের গুরুত্ব বোঝা যায়। পোশাক দ্বারা ব্যক্তি চিহ্নিত হলে তাদের কাছ থেকে কাজের সুবিধা পাওয়া যায়। জনসাধারণও তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিতে পারে। যেমন, পোশাক পরা পুলিশ দেখে নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করা। রেস্টুরেন্টে বেয়ারাকে খাবারের জন্য নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

খেলোয়াড়দের জার্সি বা পোশাক দেখে বোঝা যায় কে ফুটবল খেলে, কে ক্রিকেট খেলে বা কে কুস্তিগীর। বাংলাদেশের উপজাতিদেরও পোশাক দেখে বলা যায় তারা কোন এলাকায় বসবাস করে।

৫. পদমর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সব দেশেই বিশেষ পেশার জন্য নির্ধারিত পোশাক বা ইউনিফরম পরার নিয়ম আছে। কোনো কোনো অফিসে চাকরির মর্যাদা অনুযায়ী নিজস্ব পোশাক বা ইউনিফরম ব্যবহার করা হয়। বিশেষ পোশাক এবং তার সাথে মনোগ্রামসহ প্রতীক বা ব্যাজ ব্যবহারের ফলে উঁচু ও নিম্নমানের কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরলে নিম্নতম কর্মচারীদের তাদের বড় অফিসারদের প্রতি সম্মান দেখানো সহজ হয়। যেমন-রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ ইউনিফরম পরা পুলিশ অফিসার দেখলে স্যালুট জানায়। অফিসের দারোয়ান গাড়িতে অফিসের পোশাক পরা কর্মকর্তাকে দেখে গেট খুলে দেয়। অফিসের পোশাক পরার জন্য প্রত্যেকে নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বীকৃতি পায়। এজন্য কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নিজ পেশার প্রতি সম্মানবোধ ইউনিফরমের আর একটি উদ্দেশ্য।

পুলিশ, ডাক্তার, ফুটবল খেলোয়াড়

৬. সৌন্দর্য বৃদ্ধি

নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রচেষ্টা চলছে। পোশাক তেমন একটি উপযোগী মাধ্যম। মানুষ নিজের দেহের গঠন, গায়ের বর্ণ, আবহাওয়া, পরিবেশ ও চলতি ফ্যাশন অনুযায়ী রুচিসম্মত পোশাক পরে সহজেই অন্যের মন আকৃষ্ট করে। একজন রোগা, লম্বা মেয়ে যদি আড়াআড়ি ডিজাইনের ভারী কাপড়ের পোশাক পরে, তবে তাকে লম্বা ও রোগা কম লাগবে এবং সুন্দর দেখাবে। যে পোশাকে রঙের মিল, ডিজাইনের সমতা ইত্যাদি শিল্পনীতির প্রভাব থাকে, সে পোশাক মানুষকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

সতর্কতার সাথে পোশাক পরলে প্রত্যেকে নিজের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজস্ব পোশাকের যত্ন ও সংরক্ষণ

ঘরে বাইরে আমরা নানা ধরনের জামাকাপড় পরি। প্রতিদিন ব্যবহার করার ফলে এসব জামাকাপড় ময়লা হয়ে যায়, ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়। কখনও অসাবধানতার জন্য ছিঁড়ে যায়। দাগ লেগে যায় বা কখনও রং বিবর্ণ হয়ে পড়ে। পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য পরিধানকারীর নিজস্ব যত্নের ওপর নির্ভর করে। প্রয়োজনমতো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত জামাকাপড় পরিষ্কার করে ধুয়ে, শুকিয়ে জায়গামতো গুছিয়ে রাখলে পোশাকের মলিনতা দূর হয়। নতুনত্ব ফিরে আসে। তাছাড়া পোশাক টেকসই থাকে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যায়, অর্থেরও অপচয় হয় না। অযত্নে পড়ে থাকলে অনেক মূল্যবান পোশাকও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বাড়ির ছোট বড় সব সদস্যকে পোশাকের কীভাবে যত্ন নিতে হয় শিখানো উচিত। তা না হলে গৃহকর্ত্রীর ওপর অধিক চাপ পড়ে। পোশাকের যত্ন বলতে সাধারণত ব্যবহারকালীন যত্ন, পোশাক মেরামত করা, দাগ তোলা, কাপড় ধোয়া, শুকানো, ইস্ত্রি করা ও ঠিক জায়গায় সংরক্ষণ করা বোঝায়। বাড়িতে পোশাকের নিম্নলিখিত যত্ন নেওয়া হয়-

১। দৈনিক যত্ন
২। সাপ্তাহিক যত্ন
৩। মৌসুমি যত্ন

দৈনিক যত্ন

দৈনিক ব্যবহারের জন্য সাধারণত সুতির জামাকাপড়ই বেশি ব্যবহার করা হয়। দৈনিক পরার পোশাকগুলো হল– ইউনিফরম, সাধারণ জামাকাপড়, অন্তর্বাস, জুতা–মোজা, ফিতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিদিনই যত্ন নিতে হয়।

ইউনিফরম

স্কুল, কলেজ এবং অফিস আদালতের জন্য নির্ধারিত বস্ত্র ও ডিজাইনের পোশাককে ইউনিফরম বলা হয়। ইউনিফরম পরিষ্কার থাকলে প্রতিদিন ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। দুদিন পরপর ধুলেও চলে। ব্যবহারের পর ঘাম শুকানোর জন্য খুলে ঝাড়া দিয়ে বাতাসে মেলে দিতে হয়। ঘাম শুকালে ইস্ত্রি ও ভাঁজ করে আলনা বা বাক্সে তুলে রাখলে পরদিন পরা যায়।

ইউনিফরম ময়লা হলে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নীল দিয়ে ইস্ত্রি করতে হবে। ইস্ত্রির পর ভাঁজ করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে, যাতে সহজে পাওয়া যায়।

সাধারণ জামাকাপড়

সাধারণ জামাকাপড় পরে ঘরে বাইরে নানা ধরনের কাজ করা হয়। ফলে ময়লা হয়ে যায়, ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়। অনেক সময় বোতাম খুলে যায়। অসাবধানতার জন্য দাগ লাগতে পারে নতুবা খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। প্রথমে বোতাম লাগিয়ে নিতে হবে। ছেঁড়া থাকলে রিফু বা সেলাই করে নিতে হবে। কোনো দাগ লাগলে পদ্ধতি অনুযায়ী দাগ তুলতে হবে। সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনবোধে নীল মাড় দিয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করতে হবে। এসব কাপড় ভাঁজ করে আলনা বা আলমারির এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

ইউনিফরম পরা স্কুল ছাত্রী

অন্তর্বাস

অন্তর্বাস বলতে গেঞ্জি, সেমিজ, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি পোশাককে বোঝায়। যে কোনো অন্তর্বাসই গায়ের চামড়ার সাথে লেগে থাকে। সেজন্য ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, গায়ের ময়লা লেগে নোংরা হয়। অন্তর্বাস একবার ব্যবহারের পরেই সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে। সাদা হলে নীল দিতে হবে। এগুলোতে কখনও মাড় দিতে নেই। মাড় দিলে পরতে অস্বস্তি লাগবে।

জুতা-মোজা

বাইরে থেকে ফিরে পোশাকের সাথে মানুষ জুতা-মোজাও খুলে রাখে। জুতায় ময়লা থাকলে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে বাতাসে শুকাতে দিতে হবে। ভিজে গেলে হালকা রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। জুতা বেশি রোদ কিংবা আগুনের কাছে শুকালে কুঁচকে আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। কালি উঠে গেলে শুকিয়ে কালি দিয়ে রাখতে হবে। মোজা খুলে ঝেড়ে বাতাসে ঘাম শুকাতে হয়। মোজা ঘামে ভিজে খুবই দুর্গন্ধ হয়। সেজন্য প্রতিদিনই সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে।

ফিতা

মেয়েরা চুল বাঁধার জন্য সাদা, রঙিন বিভিন্ন কাপড়ের তৈরি ফিতা ব্যবহার করে। ব্যবহারের ফলে চুলের তেল, ময়লা লেগে ফিতায় দুর্গন্ধ হয়। কুঁচকে যায়। চুলের ফিতা ব্যবহারের পর প্রতিদিনই হালকা গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকাতে হবে। পরে টানটানভাবে ইস্ত্রি করে ভাঁজ করতে হবে বা ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সাপ্তাহিক যত্ন

যেসব কাপড় সপ্তাহে দু'তিন দিন পরে বাইরে যাওয়া হয়, সেগুলোর যত্ন সপ্তাহের যে দিন হাতে সময় থাকে সেদিন নিতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য পোশাকেরও সাপ্তাহিক যত্ন আছে। যেমন- বোতাম লাগানো, ছিঁড়ে গেলে বা সেলাই খুলে গেলে মেরামত করা, ময়লা কাপড় ধোয়া, নীল মাড় দেওয়া, শুকানো, ইস্ত্রি করা এবং নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখা। এগুলোই কাপড়ের সাপ্তাহিক যত্ন। এছাড়া জুতায় কালি দেওয়া, ব্যাগ পরিষ্কার করা সাপ্তাহিক কাজের মধ্যে পড়ে।

মৌসুমি যত্ন

আমরা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতুভেদে পোশাক পরি। শীতকালে সোয়েটার, চাদর, মাফলার ইত্যাদি পশমি কাপড় বা ভারী কাপড় পরা হয়। শীতের মৌসুম শেষ হলে এসব কাপড় ধুয়ে, শুকিয়ে ঠিকমতো জায়গায় সংরক্ষণ করাকে মৌসুমি যত্ন বলে।

শীতের কাপড় ভালো করে ঝেড়ে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখতে হয় অথবা ময়লা হলে শীতের শেষে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর কিছুক্ষণ বাতাসে বা ঠান্ডায় রাখা প্রয়োজন। গরম তাপ গেলে ট্রাংক বা আলমারিতে ভাঁজ করে তুলে রাখতে হবে। কোট, স্যুট হ্যাঙ্গারে ঝুলানো যায়। পশমি কাপড় হ্যাঙ্গারে ঝুলাতে নেই। এতে আকার নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে যাতে পোকায় না কাটে।

গরমকালে ব্যবহৃত পাতলা কাপড় শীত বা বর্ষাকালে পরার প্রয়োজন হয় না। সুতি কাপড় শীতের শুরুতে ধুয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে রাখতে হবে। মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। মাড়সহ কাপড় তুলে রাখলে পোকায় কাটে এবং অনেক সময় হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। যেসব দামি কাপড় মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় সেসব বর্ষার আগে ও পরে হালকা রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট জায়গায় ভাঁজ করে রাখতে হবে। বর্ষার শেষে গরম কাপড় অবশ্যই রোদে দিতে হয় নতুবা ছাতা পড়ে যায়। বাক্সে বা আলমারিতে কাপড় রাখার জন্য নিচে পুরানো কাগজ না বিছিয়ে পুরানো কাপড় বিছানো ভালো। কাগজ সহজেই পোকায় আক্রান্ত হয়। কাগজের কালি কাপড়ে লেগে নোংরা হয়। এক মৌসুমের কাপড় অন্য মৌসুমে তুলে রাখলে বাক্সে অথবা আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। শুকানো কালোজিরা এবং মচমচে করে শুকানো নিমপাতার গুঁড়া দিয়ে কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটলি তৈরি করে বাক্স এবং আলমারিতে রাখলে পোকামাকড় সহজে কাপড় নষ্ট করে না।

পোশাক সংরক্ষণের এককের পরিচিতি

পোশাক পরার পর নির্দিষ্ট জায়গায় যত্নসহকারে ভাঁজ করে বা প্রয়োজনবোধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। যেখানে সেখানে পোশাক ফেলে রাখলে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতে গিয়ে অযথা সময়, শক্তি ব্যয় হয়। অন্যদিকে কাপড়চোপড় এলোমেলো থাকলে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। পোশাকের ভাঁজ নষ্ট হয়। পোশাক ময়লা হয়। পোশাক সময়মতো হাতের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যবহারভেদে আলমারি, ট্রাংক ও বাক্স ব্যবহার করতে হয়। ঘরের যেসব জায়গায় পোশাক সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে সেসব জায়গাকে সংরক্ষণের একক বলা হয়। নিচে পোশাক সংরক্ষণের কয়েকটি এককের পরিচিতি দেওয়া হল–

আলমারি

সাধারণত কাঠ, স্টিল, হার্ডবোর্ড, রেক্সিন বা কাপড়ের তৈরি আলমারি পোশাক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যুগে জায়গা বাঁচানোর জন্য দেয়াল আলমারির প্রচলন দেখা যায়। একটি আলমারিতে কয়েকটি তাক, হ্যাঙ্গার ঝুলানোর রড, ড্রয়ার, দরজায় হুক স্ট্যান্ড, মূল্যবান সামগ্রী রাখার জন্য গুপ্ত ড্রয়ার ইত্যাদি কয়েকটি ভাগ থাকে। কাঠ ও স্টিলের আলমারির বার্নিশ যেন পাকা হয়। খারাপ বার্নিশ এবং রং গরমের তাপে গলে কাপড়ে লেগে যেতে পারে। ভালো করে বার্নিশ শুকিয়ে কাপড় রাখতে হয়। দরজা ও ড্রয়ারে যেন ফাঁক না থাকে। তাহলে ধুলোবালি ও তেলাপোকা ঢুকে কাপড়ের ক্ষতি করে।

ট্রাংক–স্যুটকেস

প্রাচীনকালে ট্রাংকের ব্যবহারই বেশি ছিল। বর্তমানে ট্রাংকের ব্যবহার কমে আসলেও গ্রামে কাপড় রাখার জন্য এখনও ট্রাংক ব্যবহার করা হয়। ট্রাংক টিন ও স্টিলের তৈরি হয়। বড় ছোট বিভিন্ন আকারের হয়। ধরার জন্য দুপাশে হ্যান্ডেল থাকে। যেসব ট্রাংকের গভীরতা বেশি সেগুলোতে অনেক কাপড় রাখা যায়। ট্রাংকের ভিতর রঙের প্রলেপ থাকলে কাপড়ে মরিচা ধরে না। ট্রাংক স্যাঁতসেঁতে মেঝে বা মাটিতে রাখলে আর্দ্রতায় কাপড় নষ্ট হয়। বেশি ভারী ট্রাংক নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়। ঘরে যেখানে বাতাস চলাচল করে সেখানে ট্রাংকে পোশাক সংরক্ষণ করতে হয়। শহরে চামড়া এবং রেক্সিনের তৈরি স্যুটকেসের ব্যবহার প্রচলিত। শীত ও গ্রীষ্মের পোশাক ন্যাপথলিন দিয়ে স্যুটকেসে সংরক্ষণ করা হয়।

বাক্স

কাঠ, হার্ডবোর্ডের তৈরি ছোট বড় আকারের বাক্সে কাপড় সংরক্ষণ করা হয়। বেশি ভারী বাক্সকে গ্রামে সিন্দুক বলে। নাড়াচাড়ার সুবিধার জন্য পায়ায় চাকা লাগানো থাকে। বাক্সের ঢাকনা ভারী হলে ধুলোবালি ও পোকামাকড় ঢুকতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার পোশাক সংরক্ষণের জন্য বাক্সের মধ্যে পার্টিশন থাকে। কাঠের বাক্সের গায়ের কাজ করা ও মসৃণ বার্নিশ থাকলে ঘরের একটি মূল্যবান আসবাব হিসেবে সৌন্দর্য বাড়ায়।

আলনা

সোজা কাঠের রড বিশিষ্ট স্ট্যান্ডকে আলনা বলে। আলনা বড়, ছোট বিভিন্ন সাইজের হয়। জুতা ও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য আলনার নিচে বাক্স বা র‍্যাক থাকে। আলনা ঘরের একপাশে রাখা ভালো। জানালার সামনে রাখা উচিত নয়, বাতাস চলাচলে অসুবিধা হয়। আলনার রডগুলো খুব মসৃণ হবে যেন পোশাকের সুতা আটকে না যায়। ভালোভাবে বার্নিশ করা থাকলে টেকসই হয়, পোশাকের ক্ষতি হয় না।

সঠিক পদ্ধতিতে পোশাক সংরক্ষণ

পোশাকের যত্নে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাইরের ধুলোবালি, কীটপতঙ্গ, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য পোশাক সংরক্ষণের একান্ত দরকার। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে সহজেই ছত্রাক জমে পোশাক নষ্ট হয়। নিয়ম অনুযায়ী পোশাক সংরক্ষণ না করলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এতে সময় নষ্ট হয় এবং বিরক্তিকরও বটে।

পোশাক সংরক্ষণের আগে জায়গা ও আসবাবপত্র এমনভাবে রাখতে হবে যেন বাতাস চলাচল করে এবং ধুলোবালি কম ঢোকে। পোশাক সংরক্ষণের জন্য ট্রাংক, আলমারি ব্যবহার করা ভালো। কারণ এগুলোতে কাপড় সংরক্ষণ করা বেশ সহজ ও নিরাপদ। পোশাক সংরক্ষণের সময় নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত—

সংরক্ষণের পূর্ব প্রস্তুতি

সংরক্ষণের পূর্বে পোশাকের কোনো জায়গা ছেঁড়া থাকলে মেরামত করে নিতে হবে। দাগ অপসারণ করে পদ্ধতি অনুযায়ী ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। পোশাক যেন ভিজা বা আর্দ্র না থাকে। ইস্ত্রি করার পর বাতাসে শুকিয়ে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা উচিত। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য পোশাকে নীল, মাড় দেওয়া ঠিক নয়। কোট, শার্ট, ব্লাউজ বা অন্যান্য জামাকাপড়ে ধাতুর তৈরি বোতাম, হুক, কাফলিং থাকে। এগুলো খুলে রাখলে মরিচা পড়ে না।

শ্রেণী ও আকৃতি অনুযায়ী

পোশাক সংরক্ষণ

বিভিন্ন ধরনের পোশাক আমরা ব্যবহার করি। যেমন শার্ট, প্যান্ট, কোট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, শাড়ি, ব্লাউজ, গরম কাপড়, চাদর, রুমাল, টুপি ইত্যাদি।

স্যুট, প্যান্ট, দামি শাড়ি আলমারির রডে হ্যাঙ্গার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে ভাঁজ নষ্ট হয় না। ব্লাউজ হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে হুকের দাগ পড়ে না। মেয়েদের জামা, পায়জামা, স্কার্ট ইত্যাদি পোশাকও হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে কুঁচকায় না বা ভাঁজ পড়ে না। সুতির শাড়ি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, চাদর এ ধরনের কাপড়গুলো ভাঁজ করে আলমারির তাকে কিংবা ট্রাংক, বাক্সে সারি করে রাখা যায়। তবে পোশাকের ধরন অনুযায়ী পৃথকভাবে রাখলে প্রয়োজনের সময় বেশি খুঁজতে হয় না।

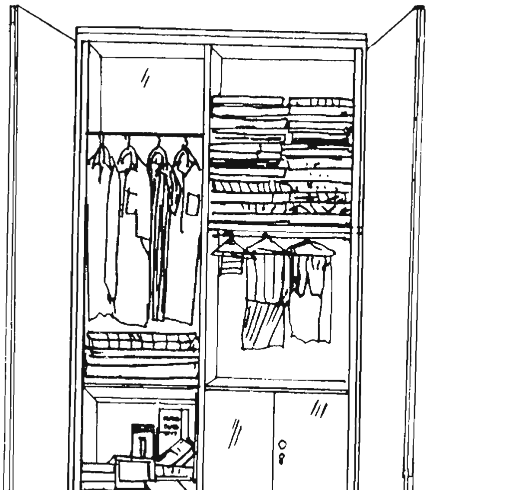

আলমারির নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষিত বিভিন্ন পোশাক

ছোট বড় আকৃতির কাপড়গুলো আলাদা রাখা উচিত। রুমাল, টুপি, মোজা, ফিতা ইত্যাদি শাড়ির ভাঁজ কিংবা বড় কাপড়ের মধ্যে ঢুকে গেলে সহজে পাওয়া যায় না। এগুলো আলমারির ড্রয়ার কিংবা বাক্সের নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত। টাই আলমারির দরজায় রড বা হুক স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।

ব্যবহার অনুযায়ী পোশাক সংরক্ষণ

কিছু কাপড় আমরা প্রায় প্রতিদিনই পরি। এগুলো আলনায় রাখা যায় নতুবা বাক্সে বা আলমারির নিচের তাকে হাতের কাছে রাখতে হয়। আলনায় শার্ট, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে ভাঁজ নষ্ট হয় না। শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা এ ধরনের কাপড়গুলো ভাঁজ করে আলনার আলাদা আলাদা তাকে রাখলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

যেসব কাপড় কোনো উপলক্ষে বা অনেকদিন পর পর আমরা ব্যবহার করি সেগুলো আলমারির উঁচু তাকে বা ট্রাংক, বাক্সে নিচের দিকে রাখা যায়। সোয়েটার, গরম চাদর, মাফলার ইত্যাদি শীতের দিনে ব্যবহারের কাপড়গুলো আলমারির উঁচু তাকে কিংবা একপাশে জায়গা করে রাখতে হয়। ট্রাংক, বাক্সে গরম কাপড় ভালো থাকে।

পশমি সোয়েটার ঝুলিয়ে রাখতে নেই। সাদা বা বাদামি কাগজে রোল করে সোয়েটার, চাদর রাখলে ভাঁজ পড়ে না।

সবসময় ব্যবহারের জুতা আলনার নিচে বাক্সে কিংবা আলাদা জুতার র‍্যাকে পরিষ্কার করে রাখা যায়। আলমারির নিচে জুতা রাখার নির্দিষ্ট তাকে মাঝে মধ্যে ব্যবহারের দামি জুতা সংরক্ষণ করা হয়।

কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করা

পোশাক সংরক্ষণের আগে খালি আলমারি, বাক্স বা ট্রাংকে পোকামাকড়ের ওষুধ ছিটিয়ে দুদিন রাখতে হবে। এরপর ভাল করে ঝেড়ে গন্ধ দূর হলে কাপড় রাখতে হয়। কাপড়ের ভাঁজে, বিশেষ করে গরম কাপড়ে ন্যাপথলিন দিতে হয়। চা পাতা, শুকানো কালোজিরা বা নিমপাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটলি করে আলমারি বা বাক্সে রাখলে সহজে পোকা বাসা বাঁধে না।

রোদে শুকানো

দীর্ঘদিন বাক্স বা আলমারিতে কাপড় থাকলে গন্ধ হয়। বর্ষার পর আর্দ্রতায় এবং বাতাস চলাচলের অভাবে পোশাকে ছাতা পড়ে যায়। এজন্য আলমারি, ট্রাংক ও বাক্সের কাপড় মাঝে মাঝে বের করে রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়। এতে অনেকদিন সংরক্ষিত পোশাক ভালো থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন দেশে কিমোনো পোশাক ব্যবহার করা হয়?

ক. ভারত	খ. চায়না
গ. গ্রিস	ঘ. জাপান

২. পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য কী?

i. বাইরের ধুলোবালি বা রোগজীবাণু থেকে দেহ ত্বককে রক্ষা করা।
ii. প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু থেকে দেহকে রক্ষা করা।
iii. পোশাক ব্যক্তিকে শনাক্ত করে শালীনতা রক্ষা করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জামাল সাহেব বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন তন্তুর পোশাক ব্যবহার করে। তিনি যত্নের সাথে তার পোশাকগুলো সংরক্ষণ করেন যাতে পোশাকগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে।

৩. জালাল সাহেব কোন উপায়ে পোশাকের যত্ন করেন।

i. দৈনিক
ii. মৌসুমি
iii. সাপ্তাহিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য পোশাকে কী দেওয়া উচিত নয়?

ক. গ্লিসারিন
খ. সিরকা
গ. রিঠা
ঘ. মাড়

৬. কোন সময় পোশাকে ছাতা পড়ে–

ক. গ্রীষ্ম
খ. বর্ষা
গ. শীত
ঘ. শরৎ

৭. জামাল সাহেব তার পোশাকগুলো কীভাবে সংরক্ষণ করেন?

i. মাড় দিয়ে কাপড় আলমারিতে তুলে রাখেন
ii. কাপড়ের ভাজে ন্যাপথলিন দেন
iii. শুকনো কালোজিরা ও নিমপাতা দিয়ে রাখেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মৌসুমি সুতি তন্তুর তৈরী বস্ত্র পছন্দ করে তবে উৎসব অনুষ্ঠানে সে রেশম বস্ত্র পরিধান করে। মৌসুমি পোশাক পরিধানের সময় ঋতুকে খুব প্রাধান্য দেয় এবং ঋতু শেষে যত্ন সহকারে পোশাক সংরক্ষণ করে।

ক. তন্তু কী?
খ. মৌসুমি পোশাক পছন্দের ক্ষেত্রে ঋতুকে প্রাধান্য দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মৌসুমি কীভাবে তার পোশাক সংরক্ষণ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুতি কাপড় ও রেশম কাপড়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২. অফিসে কামাল সাহেব শীতকালে স্যুট টাই পরেন। শীত চলে গেলে তিনি শার্ট ও প্যান্ট ব্যবহার করেন। শীতে ব্যবহৃত পোশাকগুলো না ধুয়ে আলমারিতে তুলে সংরক্ষণ করে রাখেন। কিন্তু পরবর্তী শীতে যখন তিনি আবার সে পোশাক পরিধান করতে চান তখন দেখেন পোশাকগুলো পরিধানের অনুপযোগী।

ক. পোশাক কী?
খ. পোশাক সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. কী করলে কামাল সাহবের পোশাক ব্যবহারের অনুপযোগিতা থেকে রক্ষা করা যেত বলে তুমি মনে কর।
ঘ. ঋতুভেদে তার পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করা কর।

ব্যবহারিক

পঞ্চম অধ্যায়

গর্ত করে ফলের চারা লাগানো

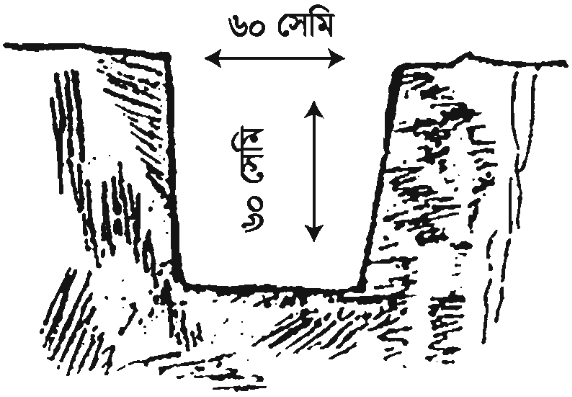

চারা রোপণের গর্ত। গর্তের মাপ ৬০ সেমি X ৬০ সেমি

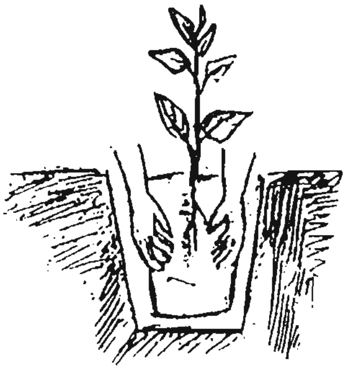

গর্তে চারা লাগানোর দৃশ্য

চারা রোপণের কমপক্ষে ৭ দিন আগে গর্তের ওপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি ওপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

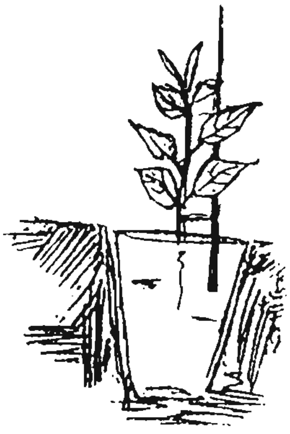

খুঁটি দিয়ে চারা হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে

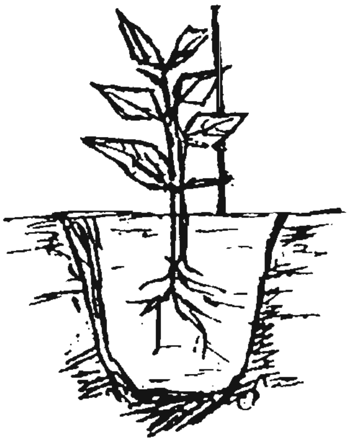

গর্তে লাগানো চারার ছবি

চারা লাগানোর পর পরই ঝাঁঝরির সাহায্যে চারায় পানি দিতে হবে।

সবজি চাষ পদ্ধতিতে সবজি বাগান করা

সবজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি

১. সবজি চাষের মডেল
২. জমি মাপার টেপ

৩. কোদাল
৪. নিড়ানি
৫. ঝাঁঝরি
৬. বাগানে পানি দেওয়ার পাইপ
৭. ২০ কেজি শুকনো গোবর সার বা আবর্জনা পচানো সার

সবজি চাষের প্রস্তুতি ও চাষ

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির যোগাড়
২. বাগানের জন্য জমি নির্বাচন
৩. সবজি চাষের মডেল অনুসরণে বাগানের নকশা তৈরি
৪. বেড়া তৈরি
৫. জমি তৈরি—মডেল বা নকশা অনুযায়ী
৬. বীজ বপন বা চারা রোপণ
৭. বাগানের পরিচর্যা

শিশুদের উপযোগী ঝুমঝুমি ও পুতুল তৈরি

খেলনা শিশুর আনন্দ বর্ধনের খোরাক হলেও শিশুর জীবনে খেলনার অনন্য মূল্য রয়েছে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশে খেলার সামগ্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর খেলনার নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকবে–

১. **নিরাপদ হতে হবে–** খেলনা তৈরির সামগ্রী এমন হতে হবে যেন শিশু আঘাত না পায়। কাপড়, হালকা মসৃণ কাঠ, নরম রবার ইত্যাদির তৈরি খেলনা শিশুর জন্য নিরাপদ।
২. খেলনা রঙিন এবং আকর্ষণীয় হবে কিন্তু রং যেন পাকা হয়।
৩. হালকা এবং শিশুর বয়স অনুযায়ী আকার হবে, যেন শিশু সহজে নাড়াচাড়া করতে পারে।
৪. বয়স উপযোগী হবে, যেমন ১ বছরের শিশুর জন্য ঝুমঝুমি, লাটিম, কাপড়ের পুতুল, নরম রবারের বল ইত্যাদি।

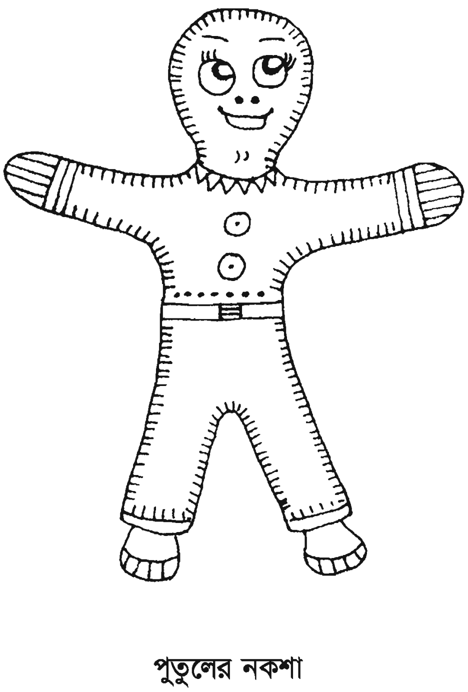
পুতুলের নকশা

পুতুল তৈরির পদ্ধতি

১. পুতুলের ছবি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আকারের (বড় বা ছোট) সাদা কাগজে একটি নকশা আঁকতে হবে।
২. হালকা রঙিন কাপড় ভাঁজ করে তার ওপর কাগজের নকশা বসিয়ে পিন আটকিয়ে নিতে হবে।

৩. নকশা অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে চারপাশে কেটে আকৃতি ঠিক রেখে বখেয়া সেলাই দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
৪. কোনো এক পাশে ২.৫ সে. মি. জায়গা খোলা রাখতে হবে উল্টিয়ে সোজা করার জন্য।
৫. সোজা করে খোলা অংশের ভিতর তুলা অথবা ছোট কাপড়ের টুকরা ঠেসে ভরে পুতুলের আকৃতি দিতে হবে।
৬. শক্ত করে তুলা ভরার পর খোলা অংশটির কাপড়ের ধারগুলো ভেতরে মুড়ে সেলাই করে বন্ধ করে দিতে হবে।
৭. এরপর কালো কালি বা কালো সুতা দিয়ে চোখ, নাক, মুখ, চুল ইত্যাদি এঁকে দিতে হবে। এভাবে অনেকে কুকুর, বিড়াল, মাছ ইত্যাদি তৈরি করে।
৮. এসব পুতুলের গায়ে বিভিন্ন পোশাক পরিয়ে এবং লেইস, চুমকি বসিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়।

ঝুমঝুমি তৈরি

যেসব শিশু সাধারণত শুয়ে বসে থাকে তাদের জন্য ঝুমঝুমি উপযোগী। ঝুমঝুমি যে রকমই হোক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন–

১. বাজবে, সুন্দর শব্দ করবে।
২. ধরার হাতল মসৃণ ও গোলাকার হবে, যেন শিশুর হাতে ব্যথা না লাগে।
৩. কাপড়, মসৃণ নরম বেত, রবার বা হালকা মসৃণ কাঠ দিয়ে তৈরি হবে।
৪. বেশি বড় বা ভারী হবে না

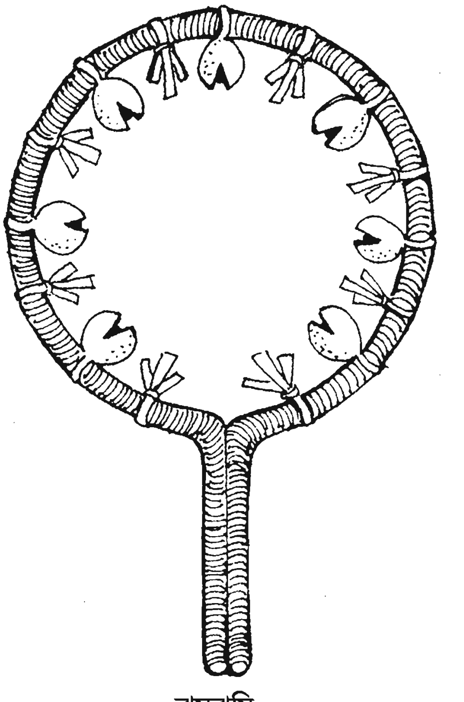
ঝুমঝুমি

ঝুমঝুমি তৈরির পদ্ধতি

১. মসৃণ সরু গোল আকৃতির ৮৭ সে. মি. বেত নিতে হবে।
২. বেতটির মাঝামাঝিতে ২০ সে. মি. ব্যাসের একটি বৃত্ত তৈরি করতে হবে। বৃত্তের অংশ বাদ দিয়ে দুপাশের হ্যান্ডেলের জন্য বেত সমান থাকবে।
৩. দুপাশের বেতের অংশ দুটি একত্রে জোড়া দিয়ে রঙিন সুতা দিয়ে সেঁটে বাঁধতে হবে। এ বাঁধন দিয়ে ধরার হাতল সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে।
৪. ঝুমঝুমির হাতলের দৈর্ঘ্য হবে ১২ সে. মি।
৫. সুতার বাঁধনের ওপর নরম করার জন্য রঙিন বা ছাপার মোলায়েম সুতির কাপড়ও পেঁচানো যায়।
৬. বৃত্তাকার অংশটিও হ্যান্ডেলের মতো সুতা ও কাপড় দিয়ে পেঁচাতে হবে।
৭. এবার বৃত্তাকার অংশে ৭/৮টি হালকা নরম প্লাস্টিকের ছোট ঘুঙুর ছবি অনুযায়ী শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে।
৮. দুটি ঘুঙুরের মধ্যে খালি জায়গায় রঙিন ফিতা কেটে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

রান্নাঘরে দৈনন্দিন সাজসরঞ্জামাদির সাথে পরিচয় ও তালিকা তৈরি

রান্না ঘরে খাদ্য প্রস্তুতের সময় বিভিন্ন রকমের কাজ হয়। যেমন– কুটাবাছা, ধোয়া, রান্না ও পরিবেশন করা। এসব কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার ধাতুর তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহার হয়। খাদ্য প্রস্তুতে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা এসব সরঞ্জামের সাথে পরিচিত হবে। কাজ অনুযায়ী তালিকা তৈরি করতে এবং যত্ন সম্পর্কে জানবে।

কাজের ধরন অনুযায়ী রান্নাঘরে ব্যবহৃত সরঞ্জামের তালিকা–

মাপার সরঞ্জাম– চায়ের চামচ, টেবিল চামচ, কাপ, গ্লাস, এক সেট মাপার সরঞ্জাম।

কাটার সরঞ্জাম– ছুরি, বঁটি, দা, কুরুনি (নারিকেল ও সবজি), বিস্কুট কাটার নকশা।

মিশাবার সরঞ্জাম– চামচ, ঘুটনি, বিটার, চালনি, গামলা, খুঞ্চা, থালা, বাটি ইত্যাদি।

রান্না করার সরঞ্জাম– বিভিন্ন আকারের হাঁড়ি, সসপ্যান, কড়াই, ফ্রাইপ্যান, তাওয়া, প্রেশার কুকার।

পরিবেশনের সরঞ্জাম– ডিশ, গামলা, বাটি, চামচ, গ্লাস, ট্রে ইত্যাদি।

রান্না ঘরে অ্যালুমিনিয়ম, স্টেনলেস স্টিল, কাচ, লোহা, মেলামাইন, বাঁশ, কাঠ, মাটি প্রভৃতির তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তবে রান্নার জন্য অ্যালুমিনিয়মের পাত্রই বেশি ব্যবহার হয়। লোহার কড়াই ভাজির জন্য উপযোগী। লোহা ও তামার পাত্রে টকজাতীয় খাদ্য রান্না করলে বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যত্ন

সব সরঞ্জামই কাজ শেষ হলে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা উচিত। অ্যালুমিনিয়মের সরঞ্জাম ছাই দিয়ে মেজে সাবান দিয়ে ধুলে পরিষ্কার থাকে। স্টেনলেস স্টিল, কাচ, মেলামাইন, বাঁশ ও বেতের সরঞ্জাম শুধুমাত্র সাবান পানি দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয়ে যায়। পাত্রে খাদ্য লেগে থাকলে প্রথমে ভিজিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ছোবড়া বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষলে উঠে যাবে। তেল উঠানোর জন্য গরম পানি ও সাবান ব্যবহার করতে হয়।

সকল প্রকার সরঞ্জামই ধুয়ে র‍্যাক বা তাকে রাখলে পানি সহজে ঝরে যায়। পানি ঝরিয়ে মোটা কাপড় বা ডিশ তোয়ালে দিয়ে মুছে রান্নাঘরে সাজিয়ে রাখলে কাজের সময় সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়। রান্নাঘরে সরঞ্জামগুলো তাকে বা আলমারিতে ছোট বড় হিসেবে সাজিয়ে রাখলে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে হয় না। যেসব সরঞ্জাম মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা হয় সেগুলোও ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখা উচিত।

খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

রান্নার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

টাটকা ফল ও সালাদে ব্যবহৃত কিছু সবজি আমরা কাঁচা খেয়ে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ খাদ্যই রান্না করে খেতে হয়। খাদ্য রান্নার উদ্দেশ্য তিনটি :

১. খাদ্য সহজপাচ্য করার জন্য–
মাছ, মাংস, শাকসবজি, চাল, ডাল সুসিদ্ধ করে খেলে সহজে পরিপাক হয়। পুষ্টিমূল্য বেশি পাওয়া যায়।

২. খাদ্যের অণুজীব ধ্বংস করার জন্য–
খাদ্যদ্রব্য অনেক সময়ই নানা রকম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। রান্নার উত্তাপে এসব জীবাণু মরে খাদ্যকে নির্দোষ করে।

৩. খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করার জন্য—
খাদ্য বিভিন্ন উপকরণ ও মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। সেজন্য খাবারের স্বাদ, গন্ধ পুষ্টিমান বেড়ে যায়। তাছাড়া রান্নার ফলে খাদ্যের ভিতর থেকে নির্যাস বের হয় এবং স্বাদ, গন্ধ বৃদ্ধি পায়।

রান্নায় সতর্কতা

খাদ্যদ্রব্য যে পদ্ধতিতেই রান্না করা হোক না কেন আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যেন নির্দিষ্ট খাদ্যের পুষ্টিমান অধিক পরিমাণে বজায় থাকে। খাদ্য প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপেই খাদ্যের পুষ্টিমান অপচয় হয়। যেমন– কাটার সময়, ধোয়ার সময়, রান্নার সময় ও পরিবেশনের সময়।

খাদ্য রান্নায় সতর্কতা অবলম্বন

১. শাকসবজি কাটার আগে ধুতে হবে।

২. খোসা ছাড়ানোর পর যথাসম্ভব বড় টুকরা করতে হবে।

৩. কাটার পর বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে না রেখে চুলায় রান্না বসিয়ে দিতে হবে।

৪. শাকসবজি রান্নায় অল্প পানি ব্যবহার করতে হবে। সিদ্ধ করে পানি ফেলা উচিত নয়।

৫. ঢেকে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে হবে।

৬. খাদ্যদ্রব্য সুসিদ্ধ হতে যতটা সময় লাগবে ততক্ষণই চুলায় রাখতে হবে। বেশিক্ষণ সিদ্ধ করলে খাবারের রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া পুষ্টিমানও কমে যায়।

৭. চালের ভিটামিন পানির সাথে মিশে যায়, সেজন্য অনেকবার চাল ধোয়া এবং রান্নার পর ভাতের মাড় ফেলা উচিত নয়।

৮. রান্নার সময় খাদ্যদ্রব্য অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

৯. রান্না করার পূর্বে রন্ধনকারী আঁটসাঁটভাবে কাপড় পরবে। টাইট করে চুল বাঁধবে। এপ্রোন পরে রান্না করা সবচেয়ে ভালো অভ্যাস। শাড়ির আঁচল, ওড়না, চুলের ফিতা অগোছালো থাকলে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে।

১০. চুলা থেকে হাঁড়ি নামানোর সময় হাঁড়ি ধরার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। ওড়না বা শাড়ির আঁচল দিয়ে কখনও হাঁড়ি নামানো উচিত নয়।

১১. তেলের কড়াইতে আগুন ধরে গেলে ঢাকনা দিতে হবে। কখনও পানি দিতে নেই।

১২. রান্না শেষ হলে চুলা নিভিয়ে রাখতে হবে।

খাদ্য পরিবেশন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গুছিয়ে খাদ্য পরিবেশনের ওপর খাওয়ার আগ্রহ ও তৃপ্তি নির্ভর করে। সুন্দর পরিবেশনের জন্য অনেক সাধারণ খাবারও মুখরোচক হয়ে ওঠে।

খাদ্য পরিবেশনের সময় লক্ষণীয় বিষয়

১. খাদ্য পরিবেশনের জায়গা ও পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পরিষ্কারভাবে ধোয়া ও মোছা থাকবে।

২. মেনু অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশনের নির্দিষ্ট সরঞ্জাম থাকবে। যেমন–ভাজির জন্য চেপ্টা প্লেট, ঝোলের তরকারি বা ডালের জন্য গর্তওয়ালা বাটি, পায়েস, দই ইত্যাদির জন্য ছোট বাটি ও চামচ ব্যবহার করতে হবে।

৩. টেবিলে খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাতের কাছে প্রয়োজনীয় খাবার পেতে অসুবিধা না হয়।

৪. খাবার টেবিলে পানির গ্লাস সম্পূর্ণ ভরে দেওয়া ঠিক নয়। এতে টেবিলে পানি পড়ে নোংরা হয়ে যায়। গ্লাসের ওপর প্রায় ২–৩ সে. মি. খালি রেখে পানি ঢালতে হয়।

৫. পরিবেশনকারিণী সবসময় বাম দিক দিয়ে খাদ্য পরিবেশন করবেন।

৬. খাবার টেবিলে নিচু আকৃতির ফুলদানি থাকবে। টেবিলে যারা খেতে বসবেন ফুলের আড়ালে যেন তাদের মুখ ঢাকা না পড়ে।

৭. খাওয়া শেষ হলে ট্রেতে করে সব সরঞ্জাম তুলে নিতে হবে।

৮. বুফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশনে প্রয়োজনীয় গ্লাস, প্লেট, চামচ, ন্যাপকিন টেবিলের দুদিকে দেওয়া থাকবে। খাবারগুলো টেবিলের দুধারে রাখতে হবে যেন সহজেই নেওয়া যায়। লোকজন বেশি এবং জায়গা কম থাকলে বুফে পদ্ধতিই ভালো। কারণ এ পদ্ধতিতে বসার জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত লোকজন দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে কয়েকটি চেয়ার ঘরের এক পাশে রাখা যেতে পারে।

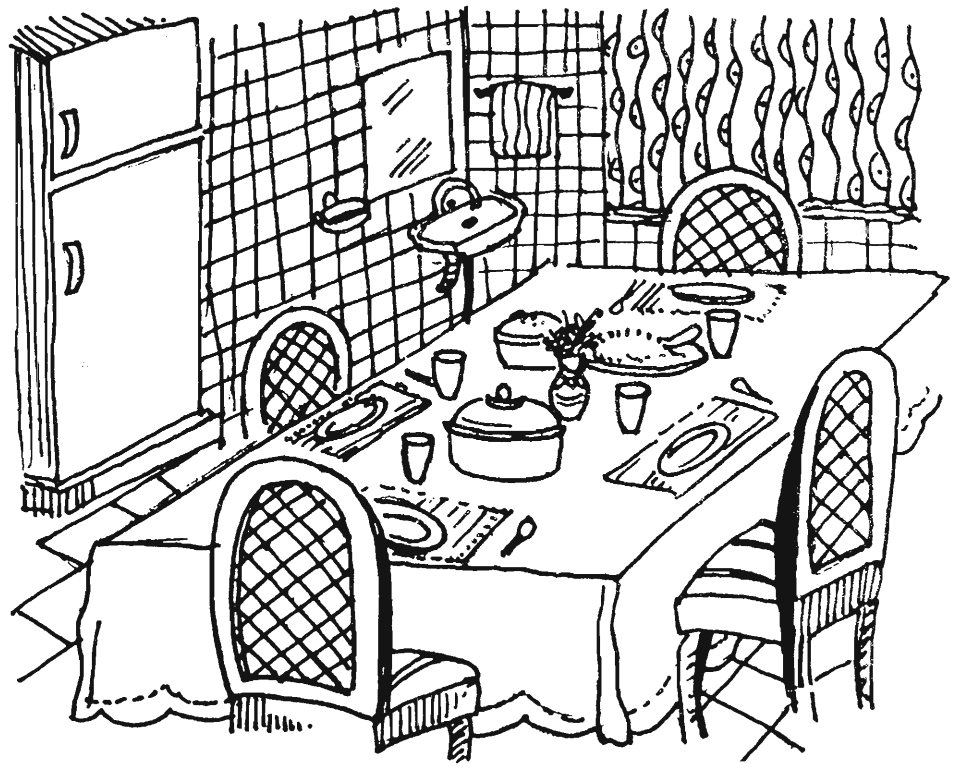

টেবিলে খাদ্য পরিবেশনের সাধারণ নিয়ম

পানীয়

শরীরে পানির চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বিশুদ্ধ সাদা পানি ছাড়াও শরবত, ডাবের পানি, ফলের রস ইত্যাদি তরল খাদ্য গ্রহণ করি। এগুলোই পানীয়। গরমের সময়, রোজার দিনে বা জ্বরে পড়লে পানীয় খুব উপকারী। নিচে কয়েকটি পানীয় প্রস্তুতের পদ্ধতি দেওয়া হল :

লেবুর শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
কাগজি লেবুর রস	৩ টেবিল চামচ
ঠান্ডা পানি	৪ কাপ
চিনি	$\frac{৩}{৪}$ কাপ
বরফ কুচি	প্রয়োজনমতো

পদ্ধতি

১. লেবু ধুয়ে ফালি করে বিচি ফেলে দিতে হবে। হাত দিয়ে চিপে রস নিতে হবে।
২. লেবুর রসের সাথে পানি, চিনি মিশাতে হবে।
৩. মিহি কাপড়ে ছেঁকে রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠান্ডা করে পান করতে হবে।
৪. বরফকুচি দিয়েও পরিবেশন করা যায়।

বেলের শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
পাকা বেল	১টি
ঠান্ডা পানি	৩ কাপ
সিরাপ বা চিনি	১ কাপ
দুধ বা দই	আধাকাপ
গোলাপজল (ইচ্ছা)	১ টেবিল চামচ
বরফকুচি	প্রয়োজনমতো

পদ্ধতি

১. পাকা বেল মাঝে ফাটিয়ে চামচ দিয়ে শাঁস তুলে এক থেকে দেড় কাপ পানিতে ভিজাতে হবে।
২. বাঁশ অথবা তারের চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।
৩. চালার পর বেলে অবশিষ্ট পানি ও ১ কাপ সিরাপ বা চিনি মিশাতে হবে। বেশি ঘন হলে পানি মিশানো যাবে।
৪. দই ফেটে নিতে হবে। দুধ বা ফেটানো দই মিশাতে হবে।
৫. গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে বেলের শরবত পরিবেশন করতে হবে। অনেকে দুধ ও গোলাপজল বাদ দিয়ে শুধু বেলের শরবত পছন্দ করেন।
৬. পরিবেশন হবে।

আমের শরবত

উপকরণ	পরিমাণ
কাঁচা আম	৪টি
সিরাপ বা চিনি	১ কাপ
ঠান্ডা পানি	৩ কাপ

লাল বা সবুজ রং (খাওয়ার) সামান্য

প্রস্তুত প্রণালী

১. কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে স্লাইস করতে হবে। আম ছেঁচে রস করতে হবে। সবজি কুরুনি দিয়ে কুরিয়ে পানি মিশিয়ে চিপেও রস নেয়া যায়।
২. আমের রসের সাথে ৩ কাপ পানি ও ১ কাপ চিনি বা সিরাপ মিশিয়ে নিতে হবে।

৩. পরিবেশনের আগে সামান্য রং মিশাতে হবে।

৪. বরফ দিয়ে আমের শরবত পরিবেশন করতে হবে।

লাচ্ছি

উপকরণ	পরিমাণ
দই	১ কাপ
ঠান্ডা পানি	১ কাপ
সিরাপ/চিনি	২ টেবিল চামচ
বরফকুচি	প্রয়োজনমতো
লবণ	ইচ্ছা

পদ্ধতি

১. দই ফেটে ঠান্ডা পানি ও সিরাপ মিশাতে হবে।

২. মিষ্টি দই হলে সিরাপ বা চিনি কম দিতে হবে। বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। ইচ্ছে হলে সামান্য লবণ মিশানো যায়।

৩. ২ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

নাশতা

সাধারণত সকালে, কখনও বিকালে নাশতার ব্যবস্থা থাকে। বাড়িতে মেহমান আসলেও নাশতা তৈরি করা হয়। নাশতায় অনেক সময় ভারী খাবারের ব্যবস্থা থাকে। আবার হালকা নানা ধরনের খাবারও নাশতার জন্য সমাদৃত হয়। নিম্নে কয়েকটি নাশতার রেসিপি দেওয়া হল :

ডিমের স্যান্ডউইচ

উপকরণ	পরিমাণ
ডিম সিদ্ধ	৩টি
মাখন বা মেয়নেজ	$\frac{১}{৩}$ কাপ
লবণ	$\frac{৩}{৪}$ কাপ
গোলমরিচ গুঁড়া	$\frac{১}{৪}$ চা চামচ
পাউরুটি	১ পাউন্ড
টমেটো	১টি
শসা/খিরা	১টি

পদ্ধতি

১. সবজি কুরুনিতে সিদ্ধ ডিম ঝুরি করে নিতে হবে।
২. শসা চিকন করে কেটে নিতে হবে নতুবা কুরুনি দিয়ে কুচি করে নিতে হবে।
৩. টমেটো পাতলা করে কেটে নিতে হবে।
৪. পাউরুটি ও টমেটো ছাড়া সব উপকরণ এক সাথে মিশাতে হবে।
৫. দুই স্লাইস পাউরুটিতে মেয়নেজ মাখতে হবে। এক স্লাইস পাউরুটির ওপর ডিমের উপকরণ ছুরি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ওপরে টমেটোর পাতলা স্লাইস বিছিয়ে দিয়ে অন্য স্লাইস পাউরুটি দিয়ে ঢেকে হাতের তালু দিয়ে চেপে দিতে হবে।
৬. ছুরি দিয়ে চারপাশ সমান করে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে বা কোনাকুনি করে কেটে স্যান্ডউইচের আকৃতি করে নিতে হবে।
৭. প্রায় ১০ টুকরা স্যান্ডউইচ হবে এক পাউন্ড পাউরুটি দিয়ে। পরিবেশন হবে।

আলুর চিপস

উপকরণ	পরিমাণ
আলু	আধা কেজি
গুঁড়া লবণ	আধা চা চামচ
সয়াবিন তেল	দেড় কাপ

পদ্ধতি

১. আলুর খোসা ছাড়িয়ে চিপস কাটা মেশিনে কেটে নিতে হবে। মেশিন না থাকলে ধারালো বঁটি দিয়ে পাতলা স্লাইস করে কাটতে হবে।
২. পানিতে লবণ গুলে ১৫–২০ মিনিট কাটা আলু ভিজাতে হবে।
৩. পানি থেকে ছেঁকে তুলে ট্রেতে বা অন্য কোনো ডিশে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে।
৪. পানি ঝরে শুষ্ক হয়ে আসলে কড়াইতে তেল গরম করতে হবে।
৫. তেলের তাপ পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে ২–১ টুকরা আলু ছেড়ে দেখতে হবে। বুদবুদ উঠলে আলু ভাজি ভালো হবে।
৬. তেলে আলু ছেড়ে মচমচে ভাজা হলে ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তুলে, তেল শুষে নেয় এমন কাগজে তুলে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।
৭. ৩ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

উপকরণ	পরিমাণ
আলু	আধা কেজি
লবণ	আধা চা চামচ
তেল	দেড় কাপ

পদ্ধতি

১. আলুর খোসা ছাড়িয়ে বড় আকৃতির আলু আঙুলের মতো মোটা ফালি করে কাটতে হবে।
২. কাটার পর লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
৩. ১০-১৫ মিনিট পর পানি থেকে তুলে বাতাসে ছড়িয়ে পানি শুকাতে হবে। প্রয়োজন হলে কাপড় চিপে পানি শুকানো যায়।
৪. ডুবো তেলে হালকা বাদামি রং করে ভেজে কাগজে রাখতে হবে তেল শুষে নেওয়ার জন্য।
৫. সস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা যায়।
৬. ৩ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

সালাদ

ফল ও সবজির সালাদ

টাটকা ফল ও সবজির সালাদ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পোলাও কোর্মা, রেজালা অথবা বিরিয়ানির সাথে টেবিলে সালাদের ডিশ খাওয়ার প্রতি রুচি বাড়ায়। খাদ্যে বৈচিত্র্য আনে। তাছাড়া রঙিন সবজি ও ফলমিশ্রিত সালাদ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়ায়। সালাদে কাঁচা টক জাতীয় ফল ও সবজি থাকে, সেজন্য ভিটামিন সি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। খোসা ছাড়ানোর পর অনেক ফল ও সবজি বাতাসের সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়। লবণ পানি, লেবুর রস বা চিনির সিরাপ মাখিয়ে রাখলে কালচে হয় না।

যেসব সবজি ও ফল দিয়ে সালাদ তৈরি করা যায়

সবজি	ফল
শসা, খিরা, টমেটো, গাজর, বীট, মুলা, বাঁধাকপি, লেটুস, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, ইত্যাদি।	বাতাবিলেবু, আমড়া, কামরাঙা, আপেল, কমলা, বেদানা, ডালিম, পেঁপে, পাকা আম, কলা, লেবু, আনারস, পাকা পেয়ারা ইত্যাদি।

পাকা ফলের সালাদ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
কলা	৪টি	জামবুরা ছাড়ানো	১টি
পেঁপে	অর্ধেক	লেবু	১টি
পেয়ারা	২টি	চিনি	২ টেবিল চামচ
আমড়া	২টি	গোলমরিচের গুঁড়া	আধা চা চামচ
আপেল	১টি		

পদ্ধতি

১. কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আপেল ছোট স্লাইস করে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে হবে।

২. আমড়াও স্লাইস করে নিতে হবে।

৩. সব ফল, গোলমরিচ গুঁড়া, চিনি, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে। খাওয়ার সময় বের করে নিতে হবে।

৪. আট জনকে পরিবেশন করা যাবে।

সবজির সালাদ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
খিরা	৪টি	কাঁচামরিচ	৪টি
গাজর	২টি	লেবু	১টি
টমেটো	৬টি	লবণ	১ চা চামচ
লেটুসপাতা	৩টি	ধনেপাতা কুচি	২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ	৪টি		

পদ্ধতি

১. সব সবজি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে স্লাইস করে বা ছোট টুকরা করে কাটতে হবে। লেটুস পাতা শুধু ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

২. পেঁয়াজ গোল করে কাটতে হবে, কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি করতে হবে।

৩. প্লেটে লেটুসপাতা বিছাতে হবে। স্লাইস ও টুকরা করা সবজিতে লবণ মাখিয়ে পাতার ওপর রাখতে হবে।

৪. কাটা পেঁয়াজ, কুঁচিকরা ধনেপাতা, কাঁচামরিচ সবজির ওপরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫. ১০–১২ জনকে পরিবেশন করা যাবে।

পোশাক প্রস্তুতকরণ ও এমব্রয়ডারি

নবজাতক শিশুর একছাঁটের জামা তৈরি

নবজাতক শিশুর জামা সাধারণত একছাঁটের হওয়া আবশ্যক। জামা নরম সুতি কাপড়ের ও ঢিলেঢালা হলে শিশু জামা পরে আরাম পাবে। এই জামার কাপড় সুতি, মলমল, তাঁত, ভয়েলের তৈরি এক রঙের অথবা, ছোট ছাপার হলে ভালো। নিম্নে নবজাতক শিশুর একছাঁটের জামার ড্রাফটিং ও সেলাইয়ের নিয়ম বর্ণনা করা হল—

জামা তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী

কাপড় ৩৫ সে. মি. পেন্সিল, রবার, গজফিতা, স্কেল, শেইপ কাঠ, পিন, সুচ, কাঁচি, সুতা, সেলাই মেশিন ইত্যাদি।

একছাঁটের ফ্রক তৈরি করার জন্য বাদামি কাগজের প্রয়োজন নেই। মাপ নিয়ে সরাসরি কাপড়ের ওপর ছাঁটা যাবে। যেমন–

মাপ– চওড়া = ৬৫ সে. মি.

লম্বা = ৩৫ সে. মি.

চিত্র কখ = ঘের এর চওড়ার $\frac{১}{৪}$

কগ = লম্বার মাপ

গঘ = কখ এবং কগ = খঘ

ঙট = হাতের বগল

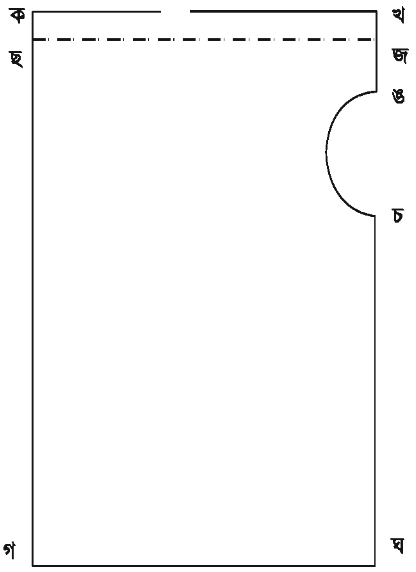

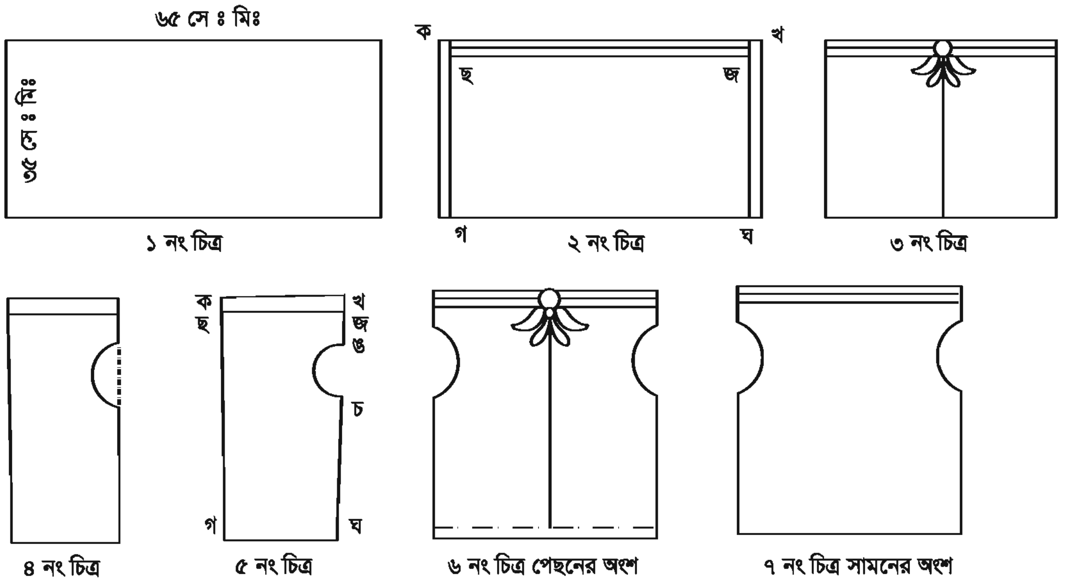

জামা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

খ থেকে ৭ সে. মি. নিচে ঙ. চিহ্নিত করতে হবে। ৬ থেকে ৭ সে. মি. নিচে চ চিহ্নিত করে ঙচ বাঁকা রেখার সাহায্যে বগলের আকৃতি করে কেটে নিতে হবে।

প্রথম ঘেরের দুই ধার সেলাই করে নিতে হবে। হাতের বগলে পাইপিং লাগাতে হবে। কছ এবং খজ রেখা ২ সে. মি. ভাঁজ করে পুরাটুকু হেম বা মেশিনে সেলাই করতে হবে। এই ভাঁজের ভিতর লম্বা ফিতা ভরতে হবে। ঝুলের নিচের অংশে ২.৫ সে. মি. ভাঁজ করে (বর্ডার) হেম করতে হবে। নবজাতক শিশুকে জামা পরিয়ে পিছনে ওপরের দিকে ফিতা টেনে হালকা গিঁট দিয়ে বো করে দিলে পুরা গলার চারদিকে কুঁচি পড়বে।

শিশুর ন্যাপি তৈরি

নবজাতক শিশুদের সাধারণত জাঙ্গিয়ার বদলে ন্যাপি পরানো হয়। এই ন্যাপি পরাতে এবং বদলাতে খুব সুবিধা। এই ন্যাপি তৈরি করতে হলে ৩৫ সে. মি. মাপের একটি বর্গাকৃতি কাপড়কে কোনাকুনি দুই ভাঁজ করতে হবে। তারপর চারদিকে একটু চওড়া করে পাইপিং দিয়ে সেলাই করতে হবে। চিত্রে খ চিহ্নিত স্থানে একটি লুপ তৈরি করে সেলাই করে ন্যাপিতে আটকে দিতে হবে। ন্যাপি পরানোর পর খ কোনার লুপ দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পেটের কাছে এনে ক কোনা খ লুপের ভিতরে দিতে হবে। কঘ এক সাথে গিঁট দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

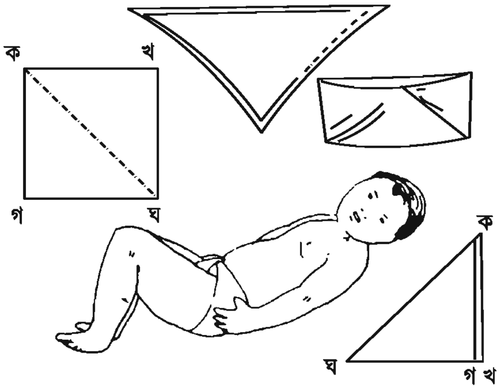

শিশুসহ ন্যাপি

এমব্রয়ডারি

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ করে থাকি। এই সেলাই বিভিন্ন ফোঁড় বা স্টিচের সাহায্যে করা হয়। সঠিক ফোঁড় ব্যবহারে একটি ডিজাইনের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। বিভিন্ন ফোঁড় ব্যবহার করে জামা, শাড়ি, টেবিল ক্লথ, ট্রে ক্লথ, বালিশের কভার ইত্যাদিতে নকশা করা হয়। এমব্রয়ডারি করতে হলে সুচ, বিভিন্ন রঙের সুতা ও ফ্রেমের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ফোঁড় শেখার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করা হল

রান ফোঁড়– হাতে সেলাইয়ের ফোঁড়গুলোর মধ্যে এই ফোঁড় সবচেয়ে সহজ। কাপড়ের ওপর নিচ দিয়ে সুচ সমানভাবে প্রবেশ করিয়ে টানা সেলাই দিতে হয়। এই ফোঁড়ের মাধ্যমে আমাদের বহুল প্রচলিত কাঁথা তৈরি হয়ে থাকে।

টাক– রান ফোঁড়ের সাহায্যে কোনো পোশাক তৈরি করার সময় অস্থায়ীভাবে যে সেলাই করা হয় তাকে টাক সেলাই বলে। যেমন দুই কাপড় একসাথে জোড়া দিতে বা প্লিট দিতে টাক সেলাই ব্যবহার করা হয়।

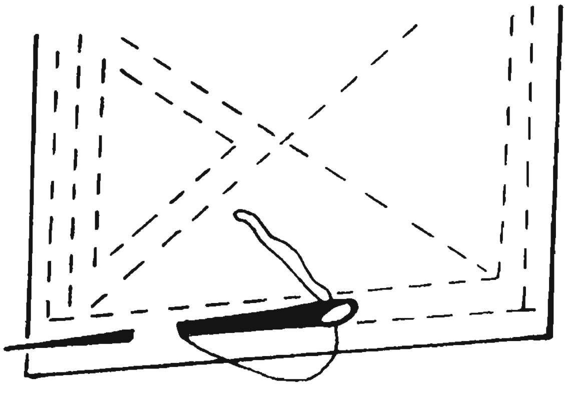
রান ফোঁড়

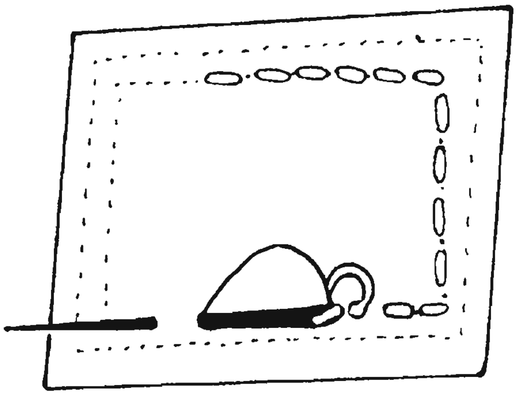
টাক সেলাই

হেম– সুচ সুতা দিয়ে কাপড়ের শেষ প্রান্ত থেকে কয়েকটা সুতা নিয়ে ফোঁড় তুলে অন্য প্রান্তের যে জায়গার সাথে মিশবে ঐ জায়গায় আর একটি ফোঁড় তুলে সুচ সুতা টেনে হেম করা হয়। গলায়, হাতের মুড়িতে, জামা ও ব্লাউজের নিচে ট্রে ক্লথ, টেবিল ক্লথ ও রুমালের কিনারায় এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের উল্টা দিকে হেম সেলাই করা হয়।

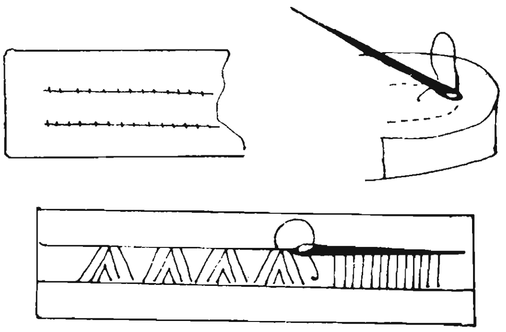

হেম ফোঁড়

বখেয়া–সুতার মাথায় গিঁট দিয়ে উল্টা দিক থেকে সুচ সোজা দিকে তুলে নিতে হয়। এই ফোঁড়ের পিছন দিকে সুচ ঢুকিয়ে আগের সেলাইয়ের সামনের দিকে সুচের মাথা বের করতে হয়। এভাবে পিছন দিক থেকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে হবে। কাপড়ের সোজা অংশে মেশিনের সেলাইয়ের মতো হবে। এই ফোঁড়ের সেলাই খুব মজবুত হয়। কোনো কাপড়ের দুই অংশ জোড়া দিতে, জামা, প্যান্ট ইত্যাদির চেন লাগাতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

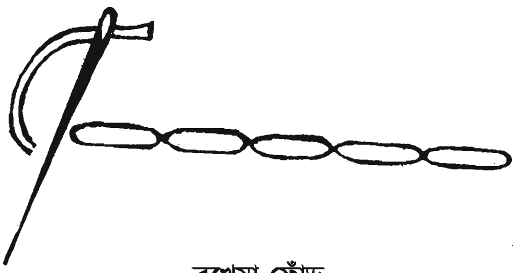

বখেয়া ফোঁড়

চেন–সুতার গোড়া থেকে সুচ সামনে তুলে সুচের মাথার ওপর দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে সুচ টান দিতে হয়। পরের ফোঁড়গুলো পূর্বের ফোঁড়ের মতো সুতার ভিতর থেকে সুচের ওপর সুতা পেঁচিয়ে তুলতে হয়। এই ফোঁড় চেইনের মতো দেখতে বলে একে চেন ফোঁড় বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার নকশার ডালে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

চেইন ফোঁড়

ক্রসস্টিচ– কাপড়ের উপর দুই লাইনের মধ্য দিয়ে বাম থেকে ডান দিকে তেরছা করে সুচ সুতাকে এগিয়ে আনতে হবে। পরবর্তী সময় ডান দিক থেকে একই লাইনে বাম দিকে তেরছাভাবে সুচের ফোঁড় তুলতে হবে। এভাবে ক্রস ফোঁড় দেওয়া হয়। চট, সেলুলার কাপড়, জায়নামাজ, ব্যাগ, চালনি, কুশন কভার ইত্যাদিতে এই ফোঁড় ব্যবহার করে নকশা তৈরি করা হয়।

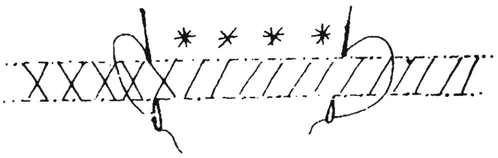

ক্রসস্টিচ

ফেদারস্টিচ– এই ফোঁড়ে সাধারণত ফোঁড়গুলো ডান এবং বাম দিকে সুচ সামান্য বাঁকা করে সুঁচের মাথার সামনে দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে করা হয়। পাখির পালকের মতো একটার পর একটা সাজানো থাকে বলে একে পালক ফোঁড় বা ফেদারস্টিচ বলা হয়। এই ফোঁড় বোতাম ফোঁড়ের মতো।

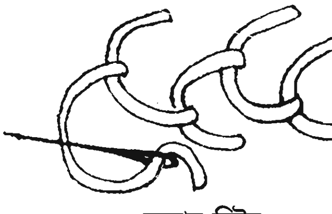

ফেদার স্টিচ

নটস্টিচ– কাপড়ের উল্টা দিক থেকে সুচের অর্ধেক কাপড়ের সোজা দিকে তুলে সুচের মাথায় তিন চার বার সুতা পেঁচাতে হবে। সুচ টেনে ডান হাতের আঙুল দিয়ে পেঁচান সুতাকে সুচের একদিকে জমিয়ে সুতার ভিতর দিয়ে শক্ত করে আগের ফোঁড়ের কাছ দিয়ে নিচের দিকে টেনে আনতে হবে। দেখতে নট বা গিঁটের মতো।

ভরাট ফোঁড়– প্রথমে নকশার জায়গায় রান ফোঁড় দিতে হবে। তারপর বাঁকাভাবে কাপড়ের ওপরে ও নিচে সুচ দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে ঘনঘন ফোঁড় তুলে নকশার জায়গাটা সুন্দর করে ভরাট করতে হবে। বাচ্চাদের ফ্রক, রুমাল, টেবিল ক্লথ, শাড়ি ইত্যাদিতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

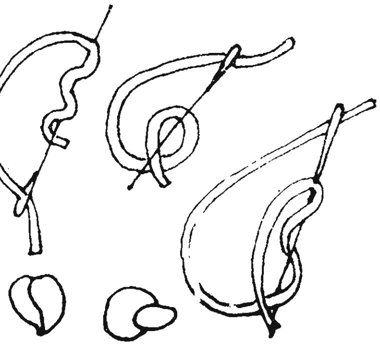

নটস্টিচ

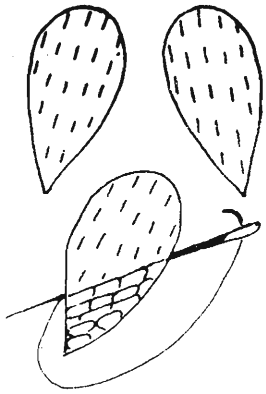

ভরাট ফোঁড়

এমব্রয়ডারি সেলাই দ্বারা বালিশের কভার/ট্রে ক্লথে লোকজ মোটিফের নকশা

বালিশের কভার বা ট্রে ক্লথ এক রঙের কাপড় দিয়ে করা যায়। তবে এগুলোকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে বিভিন্ন নকশার সেলাই করা যায়।

সাধারণত আমাদের দেশে মাছ, পাখি, ফুল, পাতা ইত্যাদির নকশা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফোঁড়ের মাধ্যমে ট্রে ক্লথ ও বালিশের কভার সেলাই করার প্রচলন দেখা যায়। এভাবে নকশা এক কোনায় বা মাঝখানেও করা যায়।

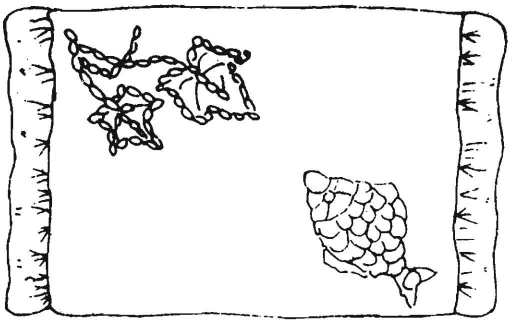

রান ফোঁড়

এই নকশাটি বালিশের কভার অথবা, ট্রে ক্লথের কোনায় এঁকে নিতে হবে। পছন্দ অনুযায়ী সুতা ব্যবহার করে চেইন ফোঁড় ও ডাল ফোঁড় দিয়ে করা হয়। ইচ্ছা করলে রান ফোঁড় দিয়ে নকশীকাঁথার মতো ভরাট করা যেতে পারে।

উল বুনন

শীতকালে নানারকম উলের পোশাক পরা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো যেমন টুপি, মোজা, মাফলার, সোয়েটার ইত্যাদি ঘরেই হাতে বোনা যায়। এখানে মোজা ও উল্টো সেলাই দিয়ে উলের মাফলার তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা করা হল—

মাফলার বুনা

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ ৯নং উলের কাঁটা ১ জোড়া, ৪ প্লাই এক রঙের উল ৩৫ গ্রাম এবং মাপার ফিতা।

বুনন পদ্ধতি

প্রথমে কাঁটায় ৪০ ঘর তুলতে হবে। এক ঘর সোজা এক ঘর উল্টা এভাবে বুনতে হবে। সোজা বুনার সময় কাটা ঘরের পিছন দিকে ঢুকিয়ে সোজা বুনতে হবে।

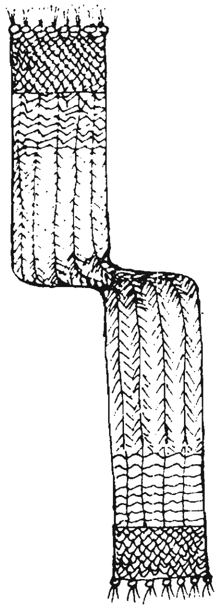
মাফলার

২য় কাঁটা বুনার শুরুতে প্রথম ঘরের পিছনে কাঁটা ঢুকিয়ে ঘরটি ডান হাতের কাঁটায় তুলে নিতে হবে। এবার সামনে সুতা এনে ১ ঘর উল্টা বুনতে হবে। তারপর ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টা বুনে লাইন শেষ করতে হবে। প্রত্যেক লাইনের শুরুতে প্রথম ঘর না বুনে পিছনে কাঁটা ঢুকিয়ে ঘর তুলে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সোজা বুনার সময় ঘরের পিছন দিকে কাঁটা ঢুকাতে হবে। এভাবে বুনে ৭০ সে. মি. লম্বা হলে ঘর বন্ধ করতে হবে। এবার ১৬ সে. মি. লম্বা ১৪ টুকরা উল নিতে হবে।

এক টুকরা উল ২ ভাঁজ করে মাফলারের ১ কোনায় ঢুকাতে হবে। উলের দুই মুখ সমান রেখে গিঁট দিয়ে ঝালর করতে হবে। মাফলারের দুই প্রান্তে সমান দূরত্বে ৭টি করে ঝালর হবে।

ক্রুসের কাজ–লং চেন দ্বারা গ্লাসের ঢাকনা তৈরি

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

১১ নম্বর ক্রুস কাঁটা ১টি

ক্রচেট সুতা ১ গুটি

মটর আকারের ও সুতার রঙের পুঁতি ২০টি।

তৈরি পদ্ধতি

১ম লাইন : প্রথমে ১০ চেন করে গোল করে নিতে হবে।

২য় লাইন : গোলের চারদিকে ঘন ১ লাইন লং (১৮টি লং) বুনতে হবে।

৩য় লাইন : চেন ও লং করে মোট ৮ বার বোনার পর ৭টি ছিদ্র হবে।

৪র্থ লাইন : ৫ চেন ও প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে ৩ লং করতে হবে। এরপর ৪টি চেন করে লাইন শেষ করতে হবে।

৫ম লাইন : ঘন ১ লাইন লং বুনতে হবে।

৬ষ্ঠ লাইন : ২ চেন ৩ লং করে লাইন শেষ করতে হবে।

৭ম লাইন : ৪ চেন এবং প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে ২ লং করে বুনতে হবে।

৮ম লাইন : ঘন ১ লাইন লং বুনতে হবে।

৯ম লাইন : ৩ চেন ২ লং করে বুনতে হবে।

১০ম লাইন : কিনারে ১০ চেন করে প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্যে হাফ লং দিয়ে আটকে দিতে হবে। এভাবে চারদিকে ঝালরের মতো বুনে যেতে হবে। এক ঝালর বাদ দিয়ে পুঁতি লাগাতে হবে।

ঢাকনার মাপ ঝলরসহ ১৩.৫ সে. মি. ব্যাসের হবে।

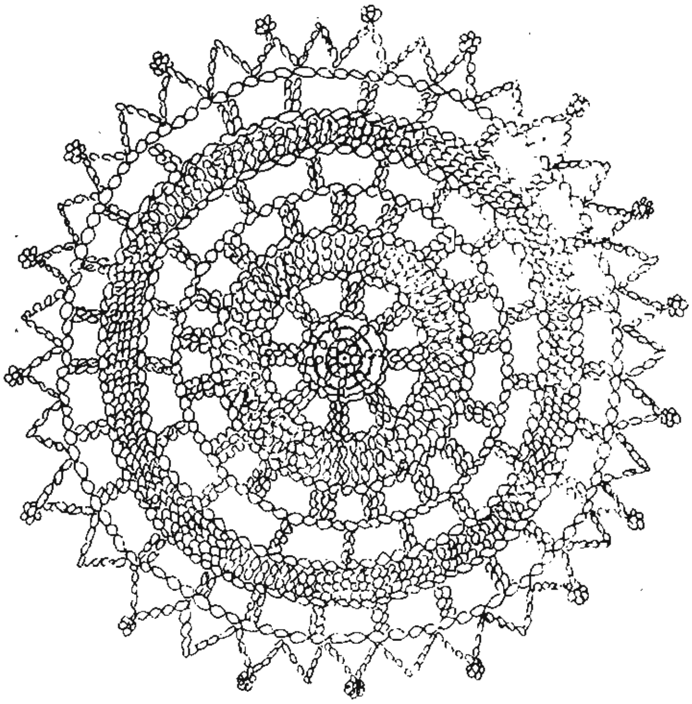

গ্লাসের ঢাকনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছাগল পালন

আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল অন্যতম। এ দেশে গ্রামে প্রায় পরিবারই ছাগল পালন করে থাকে। ছাগল শান্তশিষ্ট উপকারী প্রাণী। ছাগল ছোট প্রাণী। ছোট খামার এবং বসতবাড়িতে অল্প খরচে এদের পালন করা যায়। আমাদের দেশে ২ ধরনের ছাগল পাওয়া যায়।

যেমন–

১। দেশি জাতের ছাগল

২। বিদেশি জাতের ছাগল

দেশি জাতের ছাগল

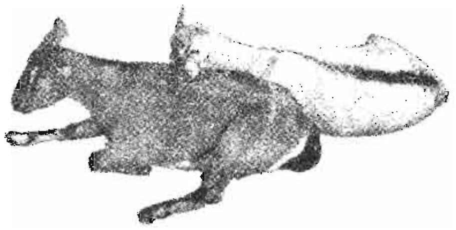

চিত্র : ছাগল গৃহপালিত শান্তশিষ্ট প্রাণী

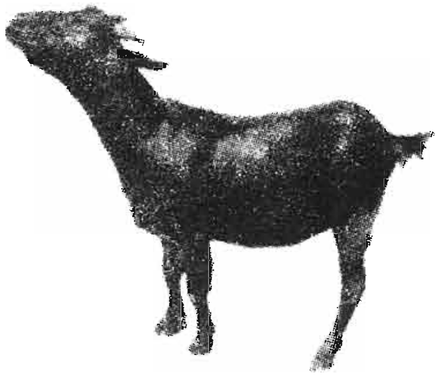

চিত্র : ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগল

দেশি জাতের ছাগলের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগল বিশ্ববিখ্যাত। বাংলাদেশে বেঙ্গাল জাতের ছাগলের মধ্যে কালো ছাগলের সংখ্যাই বেশি। এজন্য একে ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগল বলে। তবে মিশ্রভাবে সাদা ও বাদামি রঙের ছাগল আমাদের দেশে রয়েছে। এই ছাগলের মাংস ও চামড়া উন্নত মানের হয়। বিদেশে আমাদের দেশের ছাগলের চামড়ার চাহিদা বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগলের দুধ খুবই সুস্বাদু ও মাংস আমিষ সমৃদ্ধ।

চিত্র : যমুনাপাড়ি ছাগল

বিদেশি জাতের ছাগল

আমাদের দেশে বিদেশি জাতের ছাগলও পাওয়া যায়। বিদেশি জাতের মধ্যে যমুনাপাড়ি ছাগল উল্লেখযোগ্য। এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি ভারতে। এরা রামছাগল নামে পরিচিত। এরা আকারে বড় হয়। পা ও কান লম্বা। কান ঝুলানো থাকে। এসব জাতের ছাগলের রং প্রধানত বাদামি–ধূসর। এরা বেশি দুধ দেয়।

ছাগল থেকে আয়

ছাগল পালন করে আমরা পরিবারের আয় বাড়াতে পারি। পরিবারের আয় বাড়লে সচ্ছলতা বাড়ে। কৃষক পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর হয়। ছাগল পালনে মহিলারা বেশি কাজ করে থাকে। এজন্য গ্রামীণ গরিব মহিলাদের জন্য ছাগল পালন একটি আয়মূলক কর্মসংস্থান হতে পারে। এসব কারণে বাংলদেশে ছাগল পালন খুবই উপকারী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কয় ধরনের ছাগল পাওয়া যায়?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

২. ছাগল পালন করলে কী হয়?

ক. আয় বাড়ে খ. ব্যয় বাড়ে
গ. পরিবেশ নষ্ট হয় ঘ. রোগ সংক্রামিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম একজন বেকার যুবক। তার সংসারে অভাব অনটন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী করিম পরিবারের অভাব মোচনের জন্য ছাগল পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গাল প্রজাতির ছাগল পালন শুরু করেন।

ক. আমাদের দেশে কত ধরনের ছাগল পাওয়া যায়?

খ. করিমের ব্ল্যাক বেঙ্গাল পালন সুবিধাজনক মনে হয়েছে কেন?

গ. ছাগল পালন কীভাবে করিমের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে পারে লিখ।

ঘ. ব্ল্যাক বেঙ্গাল ও যমুনাপাড়ি ছাগলের পার্থক্য আলোচনা কর।